রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

ভূপেন্দ্রনাথ শীল

যে কয়েকজন মনীষী রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে রবীন্দ্রনাথের গভীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রজেন্দ্রনাথের অপরিসীম জ্ঞান-পিপাসা, গভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা রবীন্দ্রনাথকে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ প্রিয়বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেছিলেন :

'I have lost an old friend for whom I always had a sincere affection and regard'.

সে দিন রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও বলেছিলেন :

'He was one of the few in India who had made for himself a distinct place in the intellectual hierarchy of the large world, but unfortunately the last years of his life were clouded by disease that obstructed for him most of the channels of human commerce and prevented him from the proper exercise of his great scholarship. But we cannot forget that generations of our young men have received inspiration from his intellectual insight and encyclopaedic knowledge. We offer our homage of respect to his memory.'(১)

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব 'কবি ও দার্শনিকের বন্ধুত্ব'। তাঁরা দুজনেই ছিলেন সত্যদ্রষ্টা। দুজনেরই ছিল পরস্পরের প্রতি 'সপ্রেম শ্রদ্ধা'।

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ উভয়েই ছিলেন শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষা সংস্কারক। উভয়ে উভয়ের শিক্ষাবিষয়ক ভাবনার প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই শিক্ষা বিষয়ক প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছেন ও তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রসঙ্গেই এই দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রায় পত্রের বিনিময় হয়। শান্তিনিকেতনে অল্প বয়স্ক ছাত্রদের জন্য রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ভাষার নতুন শিক্ষাবিধি, 'ইংরেজি সোপান,' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রস্তুত করেছিলেন। 'ইংরেজি সোপানে' ছিল ভাষা শিক্ষার প্রত্যক্ষ রীতি। এই 'ইংরেজি সোপান' ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হল। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তখন ছিলেন কোচবিহার রাজ কলেজের অধ্যক্ষ। 'ইংরেজি সোপান' দেখে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন :

"আমি যত দূর জানি, এই পুস্তক বাঙ্গালায় এই প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার প্রণালী অত্যন্ত সুসঙ্গত—Otto, Ollendorf ও Saner প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা পুস্তক প্রণেতাগণ, এই প্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বন করিয়াই কৃতকার্য হইয়াছেন। আপনার উদ্ভাবনী শক্তির নিকট বঙ্গদেশ চিরঋণী। এই ইংরেজি শিক্ষা বিষয়েও আপনি পথ প্রদর্শকের কার্য করিয়াছেন।"(২)

বাংলা শিক্ষাদান বিষয়ে এই দুই মনীষীর চিন্তা একই ধরনের ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাস করতেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশু ও বালকদের জ্ঞান চর্চার বিশেষ প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার ওপর বিশেষ জোর দেন। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যই আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে। 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটিতেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বক্তব্যের ওপর জোর দিলেন। তিনি চেয়েছিলেন :—'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে

কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে, ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে। সত্য হইয়া উঠিবে।'

প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আরও লিখলেন :

"আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও। কিন্তু বাংলা ভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই'। নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে। শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে পৌষিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে। কিম্বা সে আগাছাও নয় যে মাঠে-বাটে নিজের পুলকে নিজেই কন্টকিত হইয়া উঠিবে।

বাংলা উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।" [৩]

রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা বিস্তার' প্রবন্ধে লিখলেন :

'শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবটিকে কাজে খাটাইবার জন্য দুইটি উপায় স্থির করা যাইতে পারে। প্রথম উপায় মাতৃভাষায় সাহিত্যের পুষ্টিসাধনের জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কলাবিদ্যা, প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ রচনা, যাহাতে মাতৃভাষার ভিতর দিয়াই ঐ সকল বিষয়ের চর্চা হইতে পারে। দ্বিতীয় উপায়—মাতৃভাষায় এই সকল বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা। যাহাতে ছাত্র ও অধ্যাপক দুজনেরই যথার্থ মানসিক বিকাশ হইতে পারে এবং উদ্ভাবনী ও সৃজনীশক্তি স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে।' [৪]

এই দুই মনীষীর জীবনের কর্মধারা দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনে দেশে কি বিদেশে তাঁরা প্রায়ই মিলিত হতেন। অথবা, তাঁদের মধ্যে সশ্রদ্ধ পত্রবিনিময় হত। ১৬ই জুন, ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূসহ লন্ডনে আসেন। তখন লন্ডনে যে কয়েকজন মনীষী রবীন্দ্রনাথকে ভালোভাবে জানতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নববিধান সমাজের প্রমথলাল সেন, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। লন্ডনে রবীন্দ্রনাথের পরিচিতদের মধ্যে ছিলেন উইলিয়ম রোটেনস্টাইন। ইতিপূর্বেই রোটেনস্টাইন ভগিনী নিবেদিতা অনূদিত 'কাবুলিওয়ালা' পড়েছেন এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ বেড়ে উঠেছিল। এর পর অজিত কুমার চক্রবর্তী অনূদিত কিছু রবীন্দ্র কবিতা তিনি পাঠ করেন। এ সময় হ্যামস্টিডে রোটেনস্টাইনের বাড়ি প্রমথলাল ব্রজেন্দ্রনাথকে নিয়ে এসেছিলেন। রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রসঙ্গ ওঠায় রোটেনস্টাইন তাঁদের রবীন্দ্রনাথকে লন্ডনে আসার জন্য পত্র দিতে বলেছিলেন। 'ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন বিলাতে তাঁহারই মনের মতো কয়েকটি হৃদয় তাঁহার অপেক্ষায় আছে—তিনি যেন বিলাতে আসেন।' [৫] লন্ডনে এসে এখন রবীন্দ্রনাথ রোটেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করলেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর উদ্বোধন সভার অধিবেশন হয়। সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন এবং সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নীলরতন সরকার ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হওয়ার তিন বছর পর ১৯২১, ২৩ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়কে সর্বসাধারণের হস্তে উৎসর্গ করেন। এই উপলক্ষে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে 'বিশ্বভারতী পরিষদ' গঠিত হয় ও বিশ্বভারতীর সংবিধান প্রণয়নের ব্যবস্থা বিহিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বিশ্বভারতীর আদর্শকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে বললেন : 'এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হল তাহা আমি শিরোধার্য করে নিছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও

বহুযুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হলাম। বহু বৎসর ধরে এই আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরণের এডুকেশনাল এক্সপেরিমেন্ট দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও 'গুরুকুল'-এর মতো দু-একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও এটি এক নূতনভাবে অনুপ্রাণিত। এর স্থান আর কিছুতে পূর্ণ হতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নীচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘরৌদ্র বৃষ্টি বাতাসে বালকবালিকারা লালিত পালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব নয়। কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালক-বালিকারা এক-পরিবার ভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনি ভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ এই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। 'বিশ্বভারতী'র কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে 'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি ধ্বনিগত অর্থও আছে। বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত ক'রে ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।'৬

রবীন্দ্রনাথও ব্রজেন্দ্রনাথের মতো একই কথা তাঁর ভাষণের শেষে বললেন ঃ 'এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিষ হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে।'৭

বিশ্বভারতীর ব্যয়ভার বহণ করতে হবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বেড়িয়ে পড়লেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দিতে। ১৯২৮-এর ১০ জুন কলোম্বো থেকে ফিরে আশ্রয় নিলেন বঙ্গলুরে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাড়ি। ব্রজেন্দ্রনাথ তখন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। বঙ্গলুরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা' লেখা শেষ করেন। ইতিপূর্বেও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭-২৮ সেপ্টেম্বর, উপাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে বঙ্গলুরে রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথের বাড়ি ছিলেন এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা হয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর ব্রজেন্দ্রনাথের ৭২ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ভারতবর্ষীয় দার্শনিক কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জয়ন্তী উৎসব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখিত এই কবিতাটি পাঠালেন ঃ

জ্ঞানের দুর্গম উর্ধ্বে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী-তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখর শ্রেণী। যেথায় গহন গুহা হ'তে
সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রস্তর ভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া কুহেলিকা
ভেদি উঠে মুগ্ধদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোজয় লিপি, যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা, যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্ত্যধরণীর দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্যরাজ্যের জাগরণ,
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্তপুরুষ

তমিস্রের পার হ'তে তেজোময়, যেথায় মানুষ
শুনে দৈব বাণী, সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,
দিক্‌সীমা প্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে,
সত্যদ্রষ্টা, যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগনে
গূঢ় হ'তে উদ্ধারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
নিত্য সুন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্য রূপে তব সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পানি।
মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি;
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্ব্বাদ, বিদায়কালের অর্ঘ্য মোর,
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর।[৮]

পরে, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ব্রজেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানালেন :

প্রিয় বন্ধুবরেষু,

আপনার চিঠিখানি পড়ে আনন্দিত হলুম। শারীরিক দুর্বলতাবশত কলকাতায় আপনার সম্বর্ধনার দিনে আমার উপস্থিত থাকা অসম্ভব ছিল তাই কবিতায় আপনার অভিনন্দন রচনা করে অনুপস্থিতির শূন্যতা পূর্ণ করবার চেষ্টা করেছি। ভালোই হোলো, আপনার 'স্মরণ' ঘোষণার মধ্যে ওটা রয়ে গেল।

আমি সম্ভবত আগামী মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় যাব। সেই সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করব।

ইতি ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬ আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [৯]

ব্রজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞায় রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ছিল পাশ্চাত্যদেশে ভারতের ভাবাত্মক আদর্শবাদের প্রচার। ইংলন্ডে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ভারতীয় দর্শনের প্রচারের চেষ্টা করলে রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি ভাবতেন অক্সফোর্ড বা অন্য কোন বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রজেন্দ্রনাথকে বসানো যায় কি না। ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনীকার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

'আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ একবার মহাসাগরের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। এই অগাধ সমুদ্রের বেলাভূমি হইতে মণিমুক্তা আহরণ করিয়া কত লোকে যে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বাহির হইতে ইহার সমীপে দাঁড়াইয়া বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে সকলে অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গী দেখিয়াছে মাত্র, কেহ ইহার তল পায় নাই।'[১০]

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ উভয়েই চাইতেন শিক্ষাদ্বারা সমস্ত ভেদবুদ্ধিকে জয় করা। রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে ব্রজেন্দ্রনাথকে লিখেছেন (১৪ কার্ত্তিক, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) :

'মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে বার্ষিক সভায় আপনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা পড়িয়া আমি বড় আনন্দ ও সান্ত্বনা পাইয়াছি। বিদ্যা সম্বন্ধে দেশের লোকের মনে সম্প্রতি যে ভেদবুদ্ধি জন্মিয়াছে তাহাতে মনে বড় বেদনা পাইয়াছি। কোনো কালেই বিদ্যাকে

খণ্ডিত করিয়া দেখা উচিত নহে বর্তমানকালে তাহা আরো অনুচিত। কারণ, বর্তমানে সকল জাতির মানুষ পরস্পরের গোচরে আসিয়াছে—এই ইন্দ্রিয়ের গোচরতাকে ভেদবুদ্ধির তিরস্করণিকার দ্বারা আবৃত করা বিধাতার অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা। মহীশূরের ছাত্রদের মনকে সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ হইতে আপনি রক্ষা করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন ইহা আপনারই যোগ্য কাজ হইয়াছে, আমিও এইরূপ কাজেরই ভার লইয়া চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি কিন্তু বড়ই বাধা। নিজেকে বড় একলা বোধ হয়।'[১১]

রবীন্দ্রনাথের প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ প্রেম তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের একপঞ্চাশৎতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সংবর্ধনা করার জন্য যে সমিতি গঠিত হয়, সেই সমিতির সদস্যগণের মধ্যে ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। সমিতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে উৎসবের দিনও কার্য ধার্য করেছিলেন। কবির সপ্তর বছর পূর্ণ হওয়ায় দেশবাসীর পক্ষে কলকাতায় কবির সম্যক সম্বর্ধনা ও উৎসবের জন্য ১৬ই মে ১৯০১ সন্ধ্যায় কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট গৃহে এক পরামর্শ সভার অধিবেশনের জন্য যাঁরা দেশবাসীর কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

রবীন্দ্রকাব্যকে সম্যক উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয় শুধু মাত্র গীতাঞ্জলির মধ্যে নিহিত নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু মাত্র mystic কবি নন। কেম্ব্রিজ থেকে ১৯১৪, ২৯ মে তারিখে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথকে ব্রজেন্দ্রনাথ এই কথাই জানালেন :

'Gitanjali সম্বন্ধে এখানে যতই আলোচনা করি, ততই দেখি কেবল আপনাকে এরা mystic বলিয়া জানে। আমি এটা পছন্দ করি না। আদত mysticism বোধ যদি এদের থাকিত, তা হলেও বুঝিতাম আপনার একটা দিক অন্ততঃ বুঝিয়াছে। কিন্তু তাহাও নহে। আর art, poetry, interpretation of life হিসাবে লোকে আপনাকে বুঝিতে শেখে ইহাই ইচ্ছা করি। আমি সেইজন্য বলি যে আপনার poetry, drama, novel and stories -এর মধ্যে Gitanjali অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জিনিষ আছে। [from the point of view of Art as the representation of life] সে সকলের তুলনায় Gitanjali জীবনের একটা রহস্যের দিক দেখাইয়াছে অবশ্য। তাহার তুলনা নাই। কিন্তু আপনাকে কেবল গীতাঞ্জলির ভিতর দিয়া দেখিলে আপনাকে ছোট করা হয়। আজকালকার শ্রেষ্ঠ কবিদের হইতেও যিনি কাব্যে শ্রেষ্ঠতর, তাঁহাকে mystic বলিয়া literary art বা কাব্য হইতে এক পাশে রাখিলে অবিচার হয়। তাহা mysticism-এর নামেই হউক আর সাধারণের নামেই হউক আর Psalmist-এর সহিত একাসনে বসাইয়া হউক। Mr. Yeats and Miss Underhill এ বিষয়ে কিয়দংশে ভুল করিয়াছেন।'[১২]

'New Essays in Criticism' নামক গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রকাব্য সম্পর্কিত মন্তব্যগুলি রবীন্দ্রকাব্যের বিশেষ স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করে। এডয়ার্ড টম্পসন তাঁর 'Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথের এই মন্তব্যগুলিকে বিশেষ মূল্য দিয়েছেন।[১৩] একটি বিশেষ রচনায় সৌন্দর্যতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারের মাধ্যমে ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কাব্যকে এক পরিপূর্ণ শিল্পসৃষ্টি হিসেবে দেখেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'Pure Art is sincere and disinterested no less than the 'will to good,' but in appraising either or in laying down the norm it would be 'pathological' to appeal to any emotion other than the emotion of contemplating the beautiful or the good. No doubt, all emotions are proper plastic stuff for constructions in

aesthetics as well as ethics; but as building material experience in all its forms is intrinsically valuable,—ideation imagination, instinct no less than emotion. But none of these enter into the norm.

What does enter into the norm and test of Poetry is not emotional 'exaltation', imaginative 'transfiguration' or disinterested 'criticism', but in and through them all, the creation of a Personality with an individual scheme of life, an individual outlook on the universe.

Judged by the above criterion, Tagore's poetic achievement is characteristically complete. His early poems are an exercise in emotional 'exaltation'. To this he soon added the art of imaginative 'transfiguration' (as in Urvasi). In his maturer achievement, he developed the criticism of life without sacrificing either exaltation or transfiguration. Finally in his consummate later art, he has summed up all these elements and achieved the supreme mastery,—the creation of a personality with an individual scheme of life an individual outlook on the universe.'[১৪]

রবীন্দ্রনাথের কর্ম ও ভাবনা চিরদিনই ব্রজেন্দ্রনাথের চিত্তকে স্পর্শ করেছে। ৫ জানুয়ারি, ১৯২৬ তারিখে মহীশুর থেকে লেখা একটি চিঠির এক অংশে ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

'Philosophical Congress-এ আপনার Presidential Address—পড়িলাম। অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। এই রাষ্ট্রীয় যুগের দিনে এরূপ রসসামগ্রী দুর্লভ হইয়া দাঁড়ইয়াছে।' [১৫]

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ তারিখে বাঙ্গালোর থেকে রবীন্দ্রনাথকে লেখা আর একটি চিঠিতে শেষ অংশে ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন :

'ঢাকায় আপনি Philosophy of Art সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার একটি Summary কাগজে পড়িলাম। কি ভাবের সম্পদে কি ভাষার মহিমায় ইহা অমর—itself an imperishable movement of art.' [১৬]

ব্রজেন্দ্রনাথের চিঠিগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বহু আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

ভারতবর্ষের ঐক্যের ভাবনা এই দুই মনীষীকেই বিশেষভাবে চিন্তিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারতবর্ষের পথ ঐক্যের পথ। বিরোধের পথ নয়। তাই 'ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এই জন্য সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায়।'

ভারতবর্ষের এই গুণ থাকাতে কোন সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে আমরা আমাদের বিস্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খৃষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না। এইখানে তাহারা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে।'

রবীন্দ্রভাবনার সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ঐক্যচিন্তার অসামান্য সাদৃশ্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। জীবনের শেষপ্রান্তে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি ভাষণে বলেছিলেন :

'My last days are embittered by one thought—the wranglings of those who as the children of India should be bound by ties of brotherhood and friendship. Remember that Hindu or Moslems, Christian or Sikh, you can fulfil the best in

your religion by a spirit of give-and-take, by giving out of your abundance and taking in a spirit of sincere amity and goodwill. All that is merely sectarian and communal must yield to a spirit of a common brotherhood of man in universal humanity.'[১৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রাম্যমান জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাববিনিময়ের মাধ্যমে মিলনের সেতু রচনা করেছিলেন। ৫ জানুয়ারি ১৯২৬-এ মহীশূর থেকে লেখা চিঠিটির শেষ অংশে ব্রজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখেছেন : 'ভারতে থাকিয়া আপনাকে East ও West এই দুই hemisphere-এরই দায় আপনাকে ঠেকাইতে হইতেছে।' রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম যাত্রার মধ্য দিয়ে হয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম-এর পরস্পরের এক সার্থক আদান প্রদান। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক আয়োজিত রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন :

'এইবারের পূর্ববারে যখন রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ভাষাতেই বলি– তিনি তীর্থযাত্রী'র মত গিয়াছিলেন এবং সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন "গীতাঞ্জলি' এবং গীতাঞ্জলি বলিতে যে বস্তু বুঝায়। ভগবানের সহিত আত্মার লীলার যে একটি দিক আছে প্রকৃতিতে, জীবনে এবং সামাজিক নানা সম্বন্ধের ভিতর দিয়া যে লীলার বিচিত্র প্রকাশ এবং যে লীলাতত্ত্ব ভারতবর্ষের অনেক কালের সাধনার ফল–সেবারে সেই বস্তুটিকে তিনি "গীতাঞ্জলির" ভিতর দিয়া পশ্চিমে লইয়া গেলেন। ইউরোপের সমস্যা-প্রপীড়িত ব্যস্ততা-সঙ্কুল ব্যক্তি জীবনে যে শান্তি রসের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল তিনি সেখানে তাহারি উৎস উৎসারিত করিয়া দিলেন। কিন্তু সেখান হইতে তিনি লইয়া আসিলেন কি ? সেখান হইতে তিনি লইয়া আসিলেন একটা বড় অশান্তি; একটা ঝঞ্ঝাবাত, একটা Storm and Stress (Strurm and drang), যাহা আজ প্রাচ্যে ব্যক্তিজীবনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।'[১৮]

সমগ্র ভাষণটিতে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম যাত্রায় পূর্ব ও পশ্চিমের পরস্পরের আদান প্রদান কিভাবে সাধিত হয়েছে তা দেখিয়েছেন। ১৯১২ ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের সফরের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা ব্রজেন্দ্রনাথ তুলে ধরেছিলেন।

উল্লেখ পঞ্জি :

১। ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৯৩৮, ৩ ডিসেম্বর) পর রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি দৈনিক সংবাদপত্র থেকে সঙ্কলিত ও সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং অন্যান্য' গ্রন্থে সন্নিবেশিত, পৃ : ১৭৭

২। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী' (প্রথম খণ্ড) পৃ : ১০৭

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,'শিক্ষার বাহন' 'সবুজপত্র', পৌষ, ১৩২২, বঙ্গাব্দ।

৪। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, 'শিক্ষা বিস্তার', পৌষ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ

৫। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী'। দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৮

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, 'বিশ্বভারতী'। 'বিশ্বভারতী' পত্রিকা'। কার্তিক-পৌষ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ পৃঃ ১১২

৭। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, 'শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী' পৃঃ ১৯৪

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথশীল, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ পৃঃ ১০৩

৯। ঐ পৃঃ ১০৫

১০। ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে সংকলিত ও সুনীল বন্দোপাধ্যায়, 'ব্রজেন্দ্রনার্থ শীল এবং অন্যান্য' গ্রন্থে সন্নিবেশিত, পৃঃ ১৭৬

১১। সুনীল বন্দোপাধ্যায়, 'ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং অন্যান্য', পৃ : ১০৫

১২। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ বঙ্গাব্দ, পৃ :

১৩। এডওয়ার্ড টমপ্সন, 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর, পোয়েট এন্ড ড্রামাটিষ্ট', পৃ : ৩৫, ৪৮, ৬৭, ৯৭

১৪। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রচনাটি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গোল্ডেন বুক অফ্ টেগোর' গ্রন্থে সন্নিবেশিত পৃ : ২৩৩

১৫। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ ১৩৭১, পৃ : ১০৮

১৬। ঐ পৃ : ১১০

১৭। সুনীল বন্দোপাধ্যায়, 'ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এবং অন্যান্য', পৃ : ১৫২

১৮। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, 'পশ্চিমে ও পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আদান প্রদান' 'প্রবাসী', ভাদ্র ১৩২৪ বঙ্গাব্দ পৃ : ৪৩৩

রবীন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল